টাউন হল নির্যাতন কেন্দ্র

রংপুর টাউন হল। জরাজীর্ণ অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে অতীতের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ঐতিহ্য এবং গর্ব বুকে ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল এ অট্টালিকা। এলো ১৯৭১ সাল। অতীতের সকল ঐতিহ্য ম্লান হয়ে গেলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় টাউন হল ভবন হলো কলঙ্কিত। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী এ ভবনকে বানালো তাদের সকল অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। বৃহত্তর রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শত শত নারীকে অপহরণ করে নিয়ে এলো তারা। আটকে রাখলো এ বন্দি শিবিরে। নারী হারালো তাদের সম্ভ্রম। জীবন দিলো অনেকে। যারা এ লজ্জা সহ্য করতে পারলো না, তারা হলের পিছনের ইন্দারায় আত্মাহুতি দিলো। টাউন হলের গ্রীন রুমসহ অন্য দু'টি রুম ছিলো বাঙালি নারীদের বন্দি শিবির।

স্বাধীনতার পর এ বন্দি শিবির থেকে প্রায় ৫০জন বিবস্ত্র নারীকে উদ্ধার করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। টাউন হল চত্বরে তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মানুষের কঙ্কাল। লাশের গন্ধে আশপাশ যাওয়া যেতো না। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন উদ্যোগী হয়ে প্রায় শতাধিক মাথার খুলি একত্রিত করে সাহিত্য পরিষদ ভবনের একটি কক্ষে স্থাপিত মুক্তি সেনানী সংস্থার অফিসে রেখেছিলো। তাও চুরি হয়ে গেলো একদিন। নির্যাতন কেন্দ্রের দেয়ালে অনেক নারী রক্ত দিয়ে লিখেছিলো তাদের শেষ কথা। সে সবও একদিন মুছে ফেলা হলো। ভরাট করা হলো চত্বরের ইন্দারাটাও। পরবর্তীতে আশপাশ এলাকায় বেশ ক'টি সাংস্কৃতিক সংগঠনকে দেয়া হলো ব্যবহারের জন্য। এখন সেখানে সাংস্কৃতিক চর্চা হয়। হয় নাটকের মহড়া। এ প্রজন্ম সঠিকভাবে জানে না তারা কোথায় দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের বিচরণ ক্ষেত্রের মাটির নিচে আছে অগণিত ত্যাগী নারীর কঙ্কাল। ভরাট করা ইন্দারায় রয়েছে আত্মদানকারী কত মা-বোনের লাশ। উৎসাহী সাংস্কৃতিক কর্মীরা টাউন হল চত্বরের পিছনে রোপণ করেছে বেশ ক'টি ফুলের চারা। সে চারা গাছে হয়তো একদিন ফুল ফুটবে। কিন্তু সে ফুলের সুবাস কি আমাদের চিত্তকে নাড়া দিতে পারবে? কঙ্কাল আর লাশের ওপর দাঁড়ানো গাছে যে ফুল ফুটবে সে ফুল কি তার সুবাস ছড়াতে পারবে?

মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা হারিয়েছি আমাদের অগণিত সূর্য সন্তানকে। তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। তাঁদের আত্মত্যাগ বাঙালি জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। এ আত্মদানের ঋণ কোন কিছুর বিনিময়ে শোধ করার নয়। মহান শহীদদের বিস্তারিত বিবরণ আমরা যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তা নিম্নে লিপিবদ্ধ হলো। এ তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। আগামী প্রজন্ম অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এ অপূর্ণাঙ্গ কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সাহেবগঞ্জের গণহত্যা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পহেলা মে । এ দিনেও পাকিস্তান হানাদার বাহিনী তাদের নির্মম হত্যাকান্ড থেকে পিছপা হয় নি । রংপুর জেলার সাহেবগঞ্জে মধ্যরাতে হত্যা করলো জংলী বাহিনী ১৯জন বাঙালি সৈনিককে । রংপুর শহরে থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে সাহেবগঞ্জ । রংপুর-সাহেবগঞ্জহাট । সদর উপজেলার তপোধন ইউনিয়নের মধ্যে এলাকাটি । মৌজার নাম বীরচরণ । প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় '৭১ এর পহেলা মে শনিবার ঠিক দুপুর বেলা ৩টি আর্মি ট্রাক সাহেবগঞ্জ এলাকায় এসে দাঁড়ায় । আশপাশের মানুষ প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায় । আর্মির গাড়ি ৩টি পনর-বিশ মিনিট হাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে । তারপর শহরের দিকে চলে যায় । সাহেবগঞ্জ এলাকার মানুষ ভয়ে ভয়ে থাকে । বেলা ডুবে যায় । রাত গভীর হতে থাকে । মধ্যরাতে হঠাৎ করে একটানা গুলির শব্দে জেগে ওঠে আশপাশের মানুষ । প্রাণভয়ে ঝাড় জঙ্গলে যে যেখানে পায় লুকায় । সবার মনে এক ধারণা আজ আর রক্ষা নেই । গুলি শেষ হবার প্রায় ১ ঘন্টা পর চার পাঁচটি আর্মির গাড়ি চারদিকে সার্চ লাইটের আলো জ্বেলে নিরীক্ষণ করে চলে যায় শহরের দিকে । আশ পাশের মানুষের দুঃখের নিশি আর শেষ হতে চায় না । ফজরের আজান সে দিন হয়েছিলো কিনা সঠিকভাবে এলাকাবাসী কেউই স্মরণ করতে পারে না । বেলা ওঠার আগেই ক'জন সাহসী মানুষ একপা দু'পা করে এগুতে থাকে সাহেবগঞ্জ হাটের দিকে । খুঁজে পায় না সেখানো কোনো কিছুই । অবশেষে আরো এগুতে থাকে উত্তর দিকে । হঠাৎ নজরে আসে পাকা সড়কের দক্ষিণ দিকে মাটি কাটা ফুটে (গর্তে) পড়ে আছে একগাদা লাশ । লাশগুলো সামান্য মাটি চাপা দেয়া । একজন দু'জন করে একত্রিত হলেন অনেকেই । সাহস করে লাশের ওপর দেয়া মাটি সরালেন তারা । আঁতকে উঠলেন সবাই লাশগুলো দেখে । সব লাশই ছিলো পিছন দিকে হাত বাঁধা এবং একই রশি দিয়ে পেঁচানো ছিলো লাশগুলো । সবার পরনেই সেনাবাহিনীর পোষাক । জমাট বাঁধা রক্তে পড়ে থাকা লাশগুলো যতদূর সম্ভব পরিস্কার করলেন গ্রামবাসী । কিন্তু কাফন পরানো সম্ভব হলো না । আশপাশের সবাই মিলে জানাজা পড়লেন । ইমামতি করলেন তকেয়ারপাড় এলাকার ছবিল উদ্দিন মুন্সী (প্রয়াত) । মুন্সী সাহেব ভয়ডরহীন । তাঁর ছেলে আব্দুর রাজ্জাক যোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে । এ ছাড়াও গ্রামবাসীদের নির্ভয় হবার কারণ হলো পুরো তপোধন ইউনিয়ন ছিলো তখন রাজাকারমুক্ত । এলাকার বহু ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এমন কি সে এলাকার একজন ভিক্ষুকের ছেলেও যোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে । জীবনের ঝুঁকি নিত ভয় পেলো না গ্রামবাসী । জানাজা শেষে ১৯জন বীর বাঙালি সৈনিককে কবর দিলেন একই সাথে । এসব আত্মদানকারী বাঙালি সৈনিকদের সবার পরিচয় জানা যায় নি । তবে একজনের পকেটে একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো । ঠিকানা লেখা ছিলো মেজর আকবর । বাড়ি ময়মনসিংহ । ২মে কবরস্থ করা বাঙালি সৈনিক শহীদরা শায়িত আছেন তপোধন ইউনিয়নের বীরচরণ মৌজায় । স্বাধীনতার পর এলাকাবাসী নিজেদের উদ্যোগে এ বধ্যভূমিটি দেয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছেন । এর অবস্থান-ইউনিয়ন তপোধন । মৌজা-বীরচরণ, জমির পরিমাণ .০১ একর । দাগ নম্বর-৯১২, খতিয়ান নম্বর-১৩৯ । ব্যক্তি মালিকানাধীন এ জমির মালিক হলেন মোঃ আযম আলী এবং মোঃ আজাহার আলী উভয়ের পিতা মরহুম জসিম উদ্দিন । স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও এ বীর শহীদদের সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর নেয়া হয় নি । বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তা আজো পরিদর্শন করেন নি এলাকাটি ।

দখিগঞ্জ হত্যাকান্ড

৩ এপ্রিল '৭১ শনিবার । রংপুরে ঘটলো এক অকল্পনীয় হত্যাযজ্ঞ । ২৫ মার্চের রাতের গোলাগুলির মতই মধ্যরাতে দখিগঞ্জ শ্মশানের কাজে গুলির শব্দ পাওয়া যায় । তখন পর্যন্ত কেউ কল্পনা করতে পারে নি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী হাত-পা বেঁধে এভাবে নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে বাঙালিদের । হানাদার বাহিনী রংপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় মানুষ 'জররেজ ভাই'সহ ১১জন বন্দি বাঙালিকে দখিগঞ্জ শ্মশানে (রংপুর-মাহিগঞ্জ রোডে) চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করে । গুলিবিদ্ধ মানুষগুলো একজনের ওপর আরেকজন ঢলে পড়ে । গুলিবিদ্ধ মানুষের স্তূপ থেকে একজন প্রাণে বেঁচে যান । তিনি হলেন তাজহাটের দীনেশ চন্দ্র ভৌমিক (মন্টু ডাক্তার) । দীনেশ ভৌমিক গুলিবর্ষণের সাথে সাথেই মাটিতে পড়ে যান এবং তার শরীরের ওপর অন্যরা পড়েন বলে তাঁর শুধু পায়ে গুলি লাগে । আর্মিরা চলে গেলে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এসে অন্যদের সহযোগিতায় ভারতে চলে যান । পরদিন দখিগঞ্জ শ্মশানের হত্যাযজ্ঞের ঘটনা রংপুরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতংকের সৃষ্টি করে । মুহূর্তের মধ্যে গোটা জেলায় জানাজানি হয়ে যায় । মানুষ ছুটে আসে শ্মশানের দিকে নিহতদের একনজর দেখতে । এদিন থেকেই রংপুরের মানুষ পালাতে শুরু করে শহর ছেড়ে গ্রামে । গ্রাম ছেড়ে আরো নিরাপদ দূরত্বে সীমান্তের ওপারে ।

সে রাতে দখিগঞ্জ শ্মশানে যাঁরা শহীদ হন তাঁরা হলেন- এ.ওয়াই.এম মাহফুজ আলী (জররেজ ভাই), মোহাম্মদ মহরম, শ্রী গোপাল চন্দ্র, দূর্গাদাস অধিকারী, উত্তম কুমার অধিকারী, দুলাল মিয়া, রফিক আলী, ক্ষীতিশ হাওলাদার এবং আরো দু'জন যাদের নাম পাওয়া যায় নি ।

বালার খাইল হত্যাযজ্ঞ

১২ এপ্রিল '৭১ সোমবার । সময় মধ্যরাত । ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ পশ্চিমে 'বালার খাইল' এ এসে দাঁড়ালো হানাদার বাহিনীর ৩টি ট্রাক । ট্রাকভর্তি চোখ, হাত বাঁধা মানুষ । তাদের একমাত্র পরিচয় তারা বাঙালি । সৈয়দপুর থেকে এসেছে ট্রাক তিনটি । সশস্ত্র হানাদার বাহিনীর বুটের শব্দ আর অশ্লীল গালি গালাজে আশপাশের যে দু'চারজন মানুষ ছিল-নিশুতি রাতে তাদেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল । বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘটনা অবলোকন করবে সে সাহসও নেই তাদের । ভয়ে দেহ যেন প্রাণহীন । পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কর্মকর্তাদের তখন একমাত্র ঘোষণা এবং একমাত্র প্রতিজ্ঞা 'উই উইল মেক দিস কান্ট্রি এ ল্যান্ড অব প্রস্টিটিউস, এ ল্যান্ড অব স্লেভস, এ ল্যান্ড অব বেগারস্ ।'

পাকিস্তানীরা তাদের সে ঘোষণাকে কার্যকরার জন্য অসহায় বন্দি ৩ ট্রাক মানুষকে গুলি করে হত্যা করলো । 'বালার খাইল' এলাকায় । এ গণহত্যা থেকে প্রাণে বেঁচে যান ২ সহোদর । একজন কমলা প্রসাদ । অন্যজন তার ছোট ভাই । কমলা প্রসাদ বর্তমানে সৈয়দপুরে আছেন ।

১২ এপ্রিলের যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দপুর থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সেখানকার বিশিষ্ট ডাক্তার এবং আওয়ামী লীগ নেতা সর্বজনপ্রিয় জিকরুল হক । ২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী জাতীয় সংসদ সদস্য ডাঃ জিকরুল হক, ডাঃ ইয়াকুব আলী, ডাঃ সামসুল হক, ডাঃ বদিউজ্জামান, আবেদ আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তুলশী রাম আগরওয়ালা, যমুনা প্রসাদ কেডিয়া, হরিহর প্রসাদ, রামেশ্বর পালসহ প্রথম অবস্থায় ২৫জনকে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখে । চলতে থাকে প্রতিরাখে তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার । পরবর্তী সময়ে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৬০জন সদস্যকে বন্দি করে হানাদার বাহিনী । রাত গভীর হবার সাথে সাথে এসব অসহায় বাঙালিদের ওপর চালানো হতো নির্যাতন । পাকিস্তানী মেজর জাভেদ এবং ক্যাপ্টেন গুল অত্যাচার চালাতো সবচেয়ে বেশি । আওয়ামী লীগ নেতা এবং সে সময়ের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ জিকরুল হককে তারা জিজ্ঞাসা করতো শেখ মুজিবের সাথে তার টেলিফোনে কি কথা হয়েছিলো । অত্যাচারে অত্যাচারে মৃতপ্রায় ডাঃ জিকরুল হক পাকিস্তানীদের কোন কথারই উত্তর দিতেন না । ২৫ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল ১৮দিন অমানুষিক নির্যাতনের পর রংপুর ক্যান্টনমেন্টের বালার খাইল এলাকায় তাঁদের হত্যা করা হয় ।

জয়রাম আনোয়ার মৌজার গণহত্যা

২২ এপ্রিল '৭১ বৃহস্পতিবার। দখলদার বাহিনী রংপুর জেলার পায়রাবন্দ ইউনিয়নে গুলি করে হত্যা করলো ২৬ জন মানুষকে। এক নামে সারাদেশের মানুষ চেনে পায়রাবন্দকে। বাংলার নারী আন্দোলনের পথিকৃত বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান। পায়রাবন্দ ইউনিয়নের জয়রাম আনোয়ার মৌজার দু'টি স্থানে এ হত্যাকান্ড চালানো হয়। রংপুর শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে পায়রাবন্দ। পায়রাবন্দ থেকে হাইওয়ে ধরে দক্ষিণ দিকে গিয়ে ১ কিলোমিটার দূরে জয়রাম আনোয়ার মৌজা। ২২ এপ্রিল মধ্যরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ৫টি ট্রাক এসে দাঁড়ালো বড় রাস্তায়। আশ পাশে তেমন বসতি নেই। চারদিকে শুনশান। বড় রাস্তার পূব দিকে দূরে ৩/৪টি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। গাড়ির শব্দে বাড়ির লোকজন জেগে উঠলেও কারো মুখে টু শব্দটি নেই। সবাই যেনো জ্যান্ত মরা। দেহ আছে। তবুও মনে হয় প্রাণ নেই। বেড়ার ফুটো দিয়ে জয়রাম গ্রামের মফিজ উদ্দিন (৭৫) উঁকি-ঝুঁকি মারেন যদি কিছু দেখা যায়। রাতের আঁধারে কিছুই বোঝা গেলো না। হঠাৎ একটানা গুলির শব্দ। গুলি চল্‌ছে তো চল্‌ছেই। আধাঘন্টা ধরে চল্‌লো গুলি। তারপর সব চুপচাপ। কোন সাড়া শব্দ নেই। মিনিট পনরো পরে বিকট শব্দ করে ট্রাকগুলো চলে গেলো রংপুর শহর অভিমুখে। রাত কেটে গেলো, মনে হলো যেনো কেয়ামত শেষ হলো-জানালেন জয়রাম আনোয়ার গ্রামের সহরউল্লাহ (৫২)।

পরদিন ভোরে আশপাশের গ্রামের লোকজন এসে দেখে বড় রাস্তার পূব দিকে পড়ে আছে লাশের গাদি। লোকজন ভয়ে ভয়ে ১১টি লাশ একখানেই কবর দেয়। রাস্তার পশ্চিম দিকে আরো এক গাদা লাশ। সেখানে গ্রামবাসী পান ১৫টি লাশ। সব লাশেরই হাত বাঁধা অবস্থায় ছিলো। পরনে ছিলো সার্ট-প্যান্ট। গ্রামবাসীরা জানে না এরা কোথাকার মানুষ। কী তাদের পেশা, কী বা পরিচয়। সবাই ভয়ে ভয়ে থেকে কোন ধর্মীয় নিয়ম কানুন না মেনেই গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে রাখে লাশগুলো। চারিদিকে পাহারা দিয়ে থাকে গ্রামবাসী কখন স্বাধীনতা বিরোধী লোকজন এসে পড়ে, কিংবা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর লোকজন চলে আসে। প্রায় ২ ঘন্টা সময় লাগে লাশগুলোকে সামলাতে। সে দিন যারা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলো তাদের সবারই একমাত্র পরিচয় ছিলো তারা বাঙালি। রংপুর-ঢাকা মহাসড়ক দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার বিলাসবহুল যানবাহন ছুটে চলে যাত্রী নিয়ে। চোখের পলকে হয়তো যাত্রীদের নজরে পড়ে পায়রাবন্দের নামফলক। কিন্তু এ পায়রাবন্দের মাটিতেই শায়িত আছেন স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দানকারী যে ২৬ জন বাঙালি তাঁদের কথা কেউই জানতে পারেন না। নাম ফলকহীন আবাদী জমি হিসেবে পড়ে আছে এ দু'টি বধ্যভূমি।

নব্দীগঞ্জ গণহত্যা

১৩ এপ্রিল '৭১ মঙ্গলবার। রংপুর শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে রংপুর- কুড়িগ্রাম সড়কের পাশে নব্দীগঞ্জে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঘটালো আরও একটি গণহত্যা। ইপিআর-এর ১১জন বীর বাঙালী সদস্যকে হত্যা করলো নির্মমভাবে। নব্দীগঞ্জে যেসব ইপিআর এর সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাঁরা ইপিআর-এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন বলে স্থানীয় লোকজনের ধারণা। হত্যাকান্ডের পরদিন স্থানীয় লোকজন এসব আত্মত্যাগী বীরদের জানাযা শেষে একই স্থানে ১১জনকে কবর দেন। ঠাকুরগাঁও থেকে এসব ইপিআর বাহিনীর সদস্যদের এনে নব্দীগঞ্জে রাতের আঁধারে হত্যা করা হয়। স্থানীয় কিছু উৎসাহী লোকজনের প্রচেষ্টায় নব্দীগঞ্জ গণকবরকে দেয়াল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

ঝাড়ুয়ার বিল ও পদ্মপুকুরের গণহত্যা

১৭ এপ্রিল '৭১। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম বাগানে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ শেষে সে স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিব নগর। মুজিব নগরকে অস্থায়ী সরকারের রাজধানী ঘোষণা করা হয়। দেশী-বিদেশী বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক আগ্রহভরে দেখছিলেন বাংলাদেশের পত্ পত্ করে ওড়ানো পতাকা। সবুজের ওপর বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত পতাকা যখন মুজিব নগরে উড়ছে ঠিক সে দিনই রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার ৮নং রামনাথপুর ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ সবুজ ভূমি হাজারো বাঙালির রক্তে লালে লাল হয়ে যায়। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী সেদিন বদরগঞ্জ রেলস্টেশনের পশ্চিমে ১ কিলোমিটার দূরে বৈরাগীর ঘুমটির কাছ থেকে দক্ষিণে বুজরুক হাজীপুর পর্যন্ত ঘিরে ফেলে। অপরদিকে খোলাহাটি স্টেশনের পূর্বদিকে ট্যাক্সের হাটের ঘুমটির কাছে দক্ষিণে করতোয়া নদীর গা ঘেঁষে বকশীগঞ্জ স্কুল পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে ঘেরাও করে বুজরুক হাজীপুর, খালিশা হাজিপুর, ঘাটাবিল, রামকৃষ্ণপুর, বাঁশবাড়ি, বানিয়াপাড়া, খোর্দ্দবাগবাড়, মাসানডোবাসহ আরো অন্যান্য এলাকার গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়। একই সাথে চালায় তারা গণহত্যা। ৫ বছরের শিশু থেকে শুরু করে নবতিপর মানুষও রেহাই পায় নি পাকিস্তানীদের হাত থেকে। সে দিনের গণহত্যায় নেতৃত্ব দেয় পার্বতীপুরের বাচ্চু খান এবং কামরুজ্জামান। স্বাধীনতার পর এরা দু'জনেই পালিয়ে যায় পাকিস্তানে। বেলা ২টা থেকে রামনাথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মানুষকে ধরে নিয়ে আসে ঝাড়ুয়ার বিল এবং পদ্মপুকুর এলাকায়। সেখানে গুলি করে হত্যা করে প্রায় দেড় সহস্রাধিক মানুষকে। বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত চলে এ হত্যাকান্ড। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যানুসন্ধানে প্রায় ৪শ' প্রাণদানকারী মানুষের বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। যা শহীদ তালিকায় সংযুক্ত করা হলো।

লাহিড়ীর হাটের গণহত্যা

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মে মাস। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সদস্যরা তখন বাঙালি হত্যায় মরিয়া হয়ে নেমে পড়েছে। ৭ মে শুক্রবার। জুম্মার নামাজ শেষ হয়েছে লাহিড়ীর হাট (স্থানীয় লোকজন বলে নারীর হাট) মসজিদে । ঠিক সে সময়ে হানাদার বাহিনীর ৪টি ট্রাক এসে দাঁড়ালো মসজিদের সামনে। প্রাণভয়ে মুসল্লীরা ছুটতে থাকলেন। ৩২ জনকে ধরে ফেল্‌লো হানাদার বাহিনী। পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেলো লাহিড়ী হাট পুকুর পাড়ে। সেখানে গুলি করে হত্যা করলো তাঁদের। প্রাণদানকারী এসব মানুষের সবার পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তৃণমুল পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে যাঁদের পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন-রংপুরের রাধাবল্লভের আবেদ আলী সরকারের পুত্র মনোয়ার হোসেন বেনু, সাতগাড়া মিস্ত্রিপাড়ার শমসের আলী পেয়াদার পুত্র নওয়াব আলী বাপাত, পীরজাবাদের আব্দুল মজিদের পুত্র আব্দুল করিম, দামোদরপুরের শমসের আলী পানাতির পুত্র আজগার আলী, আমীর উল্লাহ শাহ্-এর পুত্র শাহ্ সেকেন্দার আলী, সেকেন্দার আলীর পুত্র মিন্টু মিয়া, নয়া মিয়া প্রেসিডেন্ট-এর পুত্র শাহ্ নূরল আনাম, খোদা বকস্ মৌলবীর পুত্র মোঃ আজাহার আলী, ন্যাকাড়টারী বড়বাড়ি নছির উদ্দিন-এর পুত্র আব্দুস সাত্তার, বাতাসু মিয়ার পুত্র মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, আব্দুল মকিত এর পুত্র মোঃ নবান মিয়া, মোঃ কান্দুরা মিয়ার পুত্র মোঃ আব্দুল আজিজ, খোকা মামুদ-এর পুত্র মোঃ এসরাত উল্লাহ, মোঃ আব্দুল গফুর এর পুত্র মোঃ নূরুল ইসলাম, করিম উদ্দিন মুন্সীর পুত্র মোঃ আব্দুস সোবহান, মোঃ আলিম উদ্দিন-এর পুত্র মোঃ ইয়াছিন আলী, মোঃ আলিম উদ্দিন এর পুত্র মোঃ সোলেমান মিয়া, হাছেন আলীর পুত্র মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মিয়াজন মিয়ার পুত্র মোঃ মনসুর আলী, শহর উদ্দিন-এর পুত্র মোঃ লুৎফর রহমান, আব্দুল জব্বার-এর পুত্র আব্দুর রহিম, দেওডোবা বড়বাড়ির মোঃ আমিন উদ্দিন-এর পুত্র মোঃ আজগার আলী, আব্দুল গফুর এর পুত্র মোঃ মহবুল হক, মোঃ কলিম উদ্দিন এর পুত্র মোঃ নছির উদ্দিন, দেওডোবার আতিয়ার রহমান এর পুত্র মোঃ আকাব্বর আলী, মছির উদ্দিন এর পুত্র মোঃ মনছুর আলী, খট্টু শেখ এর পুত্র মোঃ আব্দুল জব্বার মিয়া।

অপর ৫জন প্রাণদানকারী মানুষের পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। মুসলমান হিসেবে দাবিকৃত পাকিস্তানী হানাদারদের এ নির্মম হত্যাকান্ডের পর পুরো এলাকা জনমানব শূন্য হয়ে যায়। প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় এলাকাবাসী। ৩২ জন মুসল্লীর লাশ পড়ে থাকে লাহিড়ীরহাট বধ্যভূমিতে। তাদের দাফন করার মতো এলাকায় ছিলো না কোনো মানুষ। মুসল্লীদের লাশের পাশে বসে কেউ কোরান তেলাওয়াত করে নি। কাফন পরানো হয় নি তাদের। গোলাপজল কিংবা লোবান, কর্পূরের গন্ধে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে নি। মুসলমান হিসেবে দাবিদার পাকিস্তানী হায়নাদের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিলো রংপুরের ৩২ জন বাঙালি মুসল্লী।

রংপুর শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে রংপুর-বদরগঞ্জ সড়কের পাশে লাহিড়ীরহাট বধ্যভূমির অবস্থান। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও সামান্য একটি স্মৃতিফলক ছাড়া কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই সেখানে। নির্মিত হয় নি কোনো স্মৃতিস্তম্ভ। প্রাণদানকারী এসব বাঙালিদের কথা কি বর্তমান প্রজন্ম একবারও ভাববে না? খুঁজে দেখবে না কী অপরাধ ছিলো গ্রামের সহজসরল এসব সাধারণ মানুষের?

ঘাঘটপাড়ের বধ্যভূমি

১৪ মে শুক্রবার । সময় মধ্যরাত । রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা সংলগ্ন নিসবেতগঞ্জের আশপাশ প্রায় জনমানব শূন্য । দু'একটি বাড়িতে যাঁরা অবস্থান করছিলেন তাঁরা থেকেও যেনো নেই । হানাদার বাহিনীর কনভয়ের গোঁ গোঁ শব্দে চেতন হলো তারা । কিছুক্ষণ পর শুরু হলো একটানা গুলিবর্ষণ । তারপর সব শূনশান । আধা ঘন্টা পর আবার বিকট শব্দ করে চলে গেলো হায়নাদের কনভয় । পরদিন ভোর বেলা এক পা দু'পা করে এগিয়ে এলো আশপাশের গ্রাম থেকে কিছু মানুষ । এসে যা দেখলো তা বর্ণনাতীত । একগাদা লাশ পড়ে আছে ঘাঘট নদীর পাড়ে । সবার পরনে খাকি পোশাক । হাত পেছনে বাঁধা । সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন । এলাকাবাসীর ধারণা, তারা সবাই ছিলো ইপিআর বাহিনীর সদস্য । এতোগুলো মানুষের লাশ থেকে নিঃসৃত রক্তে ঘাঘটের পানি তখন লালে লাল হয়ে গেছে । রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে ঘাঘট দিয়ে । স্থানীয় দু'চারজন মনস্থ করলো লাশগুলো দাফন করার । কিন্তু হঠাৎ করে সকাল আটটার দিকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেপরোয়াভাবে ছুটে এলো চার পাঁচটি আর্মি ট্রাক । উদ্ধত সঙ্গিন হাতে হানাদার বাহিনীর সদস্যরা ট্রাকে দাঁড়িয়ে আছে । মানুষ প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলো । যে দু'চারজন আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো তাদের ধমক দিয়ে জানালো-'লাশ যেনো সেখানেই পড়ে থাকে । বাঙালিরা মুসলমান নয় । তাদের লাশের দাফন কাফনের দরকার নেই । যদি কেউ এ লাশগুলো দাফন কাফনের চেষ্টা করে তবে তাদেরও লাশ বানিয়ে দেয়া হবে ।' এভাবে ধমক দিয়ে দখলদার বাহিনী ফিরে গেলো ক্যান্টনমেন্টের দিকে । লাশগুলো পড়ে রইলো ঘাঘটের পাড়ে । এদের পরিচয় জানতে পারে নি এলাকার লোকজন । তবে তাদের ধারণা এরা সবাই ছিলো বন্দি ইপিআর বাহিনীর সদস্য । বেলা বাড়তে থাকলো । দূরে জুম্মার আজান হলো-আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর................ হাইয়্যালাছছালাহ্ ....হাইয়্যালাল্‌ফালাহ্ ...... ততক্ষণে লাশগুলো নিয়ে টানা-টানি শুরু করেছে কুকুর এবং শকুনেরা ।

নিসবেতগঞ্জ বধ্যভূমি

একাত্তরের সে-ই ভয়াল দিনগুলোর কথা মনে হলে আজো অব্যক্ত ব্যথায় বুক চিড় চিড় করে ওঠে। নিদারুণ বেদনায় বাকশক্তি ক্ষণিকের জন্য হয়ে আসে রুদ্ধ। স্বজন হারানো মানুষগুলোর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু করার কিছুই থাকে না। সবার অলক্ষ্যে গুমড়ে কাটে দিনমান।

২৩ মে '৭১ রোববার। রংপুর শহরের লিচু বাগান এলাকা। আশপাশের বাড়িতে রাতের খাবার প্রায় শেষ। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি শৈলেন দত্ত খেতে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় গাড়ির শব্দ শোনা গেলো। সাথে হুইসেলের শব্দ। অসংখ্য বুটের আওয়াজে প্রকম্পিত হলো মহল্লা। কিছুক্ষণ পর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। সাথে সাথে অশ্লীলভাষায় গালিগালাজ। স্পষ্ট বাংলায় শোনা গেলো 'শালা মালাউনের বাচ্চা দরজা খোল'। বাধ্য হয়ে দরজা খুললেন শৈলেন দত্তের বড় বোন ইলা দত্ত। দেখেন মহল্লার পরিচিত ক'জনের পেছনে পাকিস্তানী আর্মি। দরজা খোলা মাত্র হুড় হুড় করে ঢুকে পড়লো ঘরে। শৈলেন দত্তকে ধরার জন্য আর্মিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল ছয়/সাতজন। শৈলেন দত্তকে হায়নাদের হাতে তুলে দিয়ে সাথের রাজাকাররা গিয়ে ঢুকলো অন্য দু'টি বাড়িতে। সেখান থেকে ধরে আনলো রংপুর শহরের প্রবীণ আইনজীবী পূর্ণচন্দ্র সরকার এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শঙ্কর বণিককে। মহল্লায় তখন পিনপতন নিরবতা। এ নিরবতা ভাঙ্গলো প্রবীণ আইনজীবী পূর্ণচন্দ্রের আর্তচিৎকারে। বেদম পারপিট শুরু করে দিলো রাজাকাররা মহল্লার মধ্যেই এ তিনজন অসহায় মানুষকে। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকলো। পারপিট করতে করতে পূর্ণচন্দ্র সরকার এবং শঙ্কর বণিককে একটি আর্মি জীপে তোলা হলো। কিন্তু শৈলেন দত্তকে জীপে উঠানো হলো না। পাকিস্তানী হায়নারা শৈলেন-এর পা দু'টো শক্ত করে বাঁধলো। এবং সেই রশির মাথা জীপের সাথে বেঁধে দিলো। সারি বেঁধে গাড়ি ছুটে চল্‌লো। শৈলেন দত্তের আর্তনাদে সারা পাড়া মৃতপ্রায় হয়ে গেলো। গাড়ি মহল্লা থেকে বের হয়ে ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে ছুটে চল্‌লো। শৈলেন দত্তের আর্তনাদ আর শুনতে পেলো না মহল্লাবাসী। পরদিন সকালে মহল্লার মোড়েই পাওয়া গেলো শৈলেন দত্তের রক্তে ভেজা লুঙ্গী। সবাই বুঝে গেলো যা হবার হয়েছে। কারো মুখে কোনো টু শব্দ নেই। সব শূনশান। বেলা বাড়তে থাকলো। সময় তখন সকাল ১১টা। খবর পাওয়া গেলো রংপুর ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন নিসবেতগঞ্জ হাটে গত রাতে চল্লিশ পঞ্চাশ জনকে গুলি করে মেরেছে পাকিস্তানীরা। অনেকেই দেখে এসেছে সে লাশগুলো। আইনজীবী পূর্ণচন্দ্র সরকার, শঙ্কর বণিকের লাশ সেখানে ছিল। ছিলো না শৈলেন দত্তের লাশ।

লিচুবাগান থেকে নিসবেতগঞ্জ হাট পর্যন্ত জীপের পেছনে বাঁধা শৈলেন দত্ত মিশে গেছে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পথের ধূলায়। একই সময়ে রংপুরের মানুষ হারালো তাঁদের আর একজন আপন মানুষকে। তিনি হলেন সবার প্রিয় পাখিদা। পুরো না শ্রী বিজয় চন্দ্র মৈত্র। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রংপুর বারে আইন পেশায় যোগদান করেন। থাকতেন শহরের গুপ্তপাড়ায়। দু'ছেলে চুনী ও মুকুল এবং এক মেয়ে গীতা এদের নিয়ে ছিলো তাঁর কর্মময় জীবন। শহরের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যমণি ছিলেন পাখিদা। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সবাইকে নিয়ে বাসায় আড্ডায় বসতেন। প্রাণখোলা এ মানুষটিকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অনেকেই দেশ ত্যাগের অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি অটল-অনড়। মাতৃভূমি ছাড়তে রাজি নন। অনুরোধকারীদের বলতেন 'জন্মভূমির দুর্দিনে দেশ ত্যাগ করা মহাপাপ এবং অন্যায়'।

বৃদ্ধ পিতাকে সাথে নিয়ে গুপ্তপাড়ার বাসায় থাকতেন। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে দু'ছেলেকে পাঠিয়ে দেন শ্বশুরবাড়ি নলডাঙ্গায় এপ্রিল মাসের দিকে। কিন্তু সেখানে পাকিস্তানী সেনারা তাঁর দু'ছেলে চুনী ও মুকুলকে হত্যা করে। মানসিক দিক থেকে

ভেঙ্গে পড়েন পাখিদা। বাসা থেকে বের হতেন না কোথাও। ২৫ মে মধ্যরাতে গুপ্তপাড়ার বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় দখলদার বাহিনী তাঁকে। নিসবেতগঞ্জের বধ্যভূমিতে সবার সাথে পড়ে থাকে তাঁর লাশ। হৃদয়বিদারক এ ঘটনায় হতভম্ভ হয়ে যায় সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানীরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় আইনজীবী বিজয় চন্দ্র মৈত্র পাখিদা, আইনজীবী পূর্ণচন্দ্র সরকারসহ অন্যান্য হৃদয়বান প্রাজ্ঞ মানুষকে হত্যার মধ্য দিয়ে নিঃশেষ করতে চায় বাঙালি জাতিকে। অর্ধশত মানুষের লাশ পড়ে থাকে খোলা আকাশের নিচে। বাঙালি জাতিকে হত্যার এ নক্শা বাস্তবায়নে পাকিস্তানীরা যখন ব্যস্ত, তখন তাদের আশপাশেই জন অরণ্যে স্থান নিয়েছে এ দেশের অসীম সাহসী সন্তানেরা, তাদের জাতিসত্তা রক্ষার মরণ পণ নিয়ে।

দমদমা ব্রিজে গণহত্যা

৩০ মে মধ্যরাত । কারমাইকেল কলেজ চত্বরে অতর্কিতভাবে ঢুকে পড়লো হানাদার বাহিনীর কন্‌ভয় । খুঁজতে থাকলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কোথায় থাকেন । গাড়ির শব্দে সবাই ভয়ে জরোসরো । কোথাও টু শব্দটি নেই । হানাদার বাহিনীর গাড়ি থেকে নেমে এলো ক'জন মুখোশধারী অবাঙালি । দখলদার বাহিনীকে চিনিয়ে দিলো হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধ্যাপকরা কে কোন বাড়িতে থাকেন । এক এক করে গাড়ির কাছে ধরে নিয়ে এলো অধ্যাপক সুনীল বরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রায় এবং অধ্যাপক কালাচাঁদ রায়কে । শুরু করলো রাইফেলের বাট দিয়ে বেধড়ক মারপিট । অধ্যাপক কালাচাঁদ রায়ের পত্নী মঞ্জুশ্রী রায় সে সময় স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো । ঘাতকের দল তাঁকেও রেহাই দিলো না । মারপিট করতে করতে গাড়িতে তুলে নিলো সবাইকে । সবার বাড়িতে তখোন মরাকান্না শুরু হয়ে গেছে । দখলদার বাহিনীর গাড়ি কারমাইকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলো দমদমা ব্রিজের কাছে । সেখানে গুলি করে হত্যা করলো সবাইকে । পরদিন সকাল বেলা আশপাশের মানুষ সবার লাশ দেখে হতবাক । সবাই বুঝতে পারলো দেশের শিক্ষিত সজ্জন কোনো বাঙালিকে রেহাই দেবে না হানাদার বাহিনী । মানুষ হত্যার নেশায় উন্মাদ হয়ে গেছে হায়নারা । অবরুদ্ধ সাধারণ মানুষ বেঁচে থেকেও মৃতপ্রায় । প্রতি রাত তাদের কাছে মনে হতে থাকলো-এ রাতই বোধ হয় জীবনের শেষ রাত ।

একই স্থানে ৭ জুন হানাদার বাহিনী ৩ ট্রাক সাধারণ মানুষকে মধ্যরাতে দমদমা ব্রিজের দক্ষিণ পাড়ে নির্মমভাবে হত্যা করে । স্থানীয় প্রবীণ লোকজনের বিবরণ থেকে জানা যায়, রংপুরের বাইরে থেকে এসব মানুষকে এনে হত্যা করা হয় । তাদের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি ।

জাফরগঞ্জের গণহত্যা

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। জুন মাস। মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। সে সময় তারা গেরিলা পদ্ধতিতে তাদের কর্মকান্ড শুরু করে। ৮ জুন মঙ্গলবার গেরিলারা রংপুর রেডিও স্টেশনের সম্মুখে গ্রেনেড বিস্ফোরিত করে। ৯ জুন ওরিয়েন্টাল সিনেমা হলের সামনে অনুরূপ বিস্ফোরণ ঘটায় মুক্তিযোদ্ধারা। এতে দখলদার বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা গণহারে সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করতে থাকে। রেডিও স্টেশনের আশ-পাশ থেকে বেশ কিছু মানুষকে ধরে নিয়ে যায়। রংপুর ক্যান্টনমেন্টে অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে তাদের উপর। ১০ জুন বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রংপুর-সৈয়দপুর সড়কের জাফরগঞ্জ ব্রিজের কাজে ২৪জন সাধারণ মানুষকে গুলি করে হত্যা করে হানাদার বাহিনী। ব্রিজের নিচেই পড়ে থাকে লাশগুলো। এদের দাফন করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে নি কোন মানুষ। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণদানকারী এইসব মানুষের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তবে লাশগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী, প্রবীণ ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, এরা সবাই ছিল সাধারণ কৃষক, শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। সকলের পরনে ছিল লুঙ্গি। এরা কোন দল করতো না, করতো না কোন মিটিং, মিছিল, মুক্তিযোদ্ধারাদের আশ্রয় দানের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। তাদের অপরাধ ছিলো তারা সবাই বাঙালি। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানিয়েছেন, এদের গ্রেফতারের ব্যাপারে জড়িত ছিলো তারাগঞ্জ থানার সে সময়ের প্রভাবশালী একজন বাঙালি। ২৪জন মানুষের লাশ পড়ে ছিলো ঘটনাস্থলে ২-৩ দিন যাবত। কুকুর-শকুনেরা খাবলে খাবলে খেয়েছে সেইসব বাঙালিদের। আশপাশের মানুষ অব্যক্তবেদনা বুকে নিয়ে কাটিয়েছে দুঃসময়ের দিনগুলো। তারা কিছুই করতে পারে নি সেইসব মানুষের জন্য। জাফরগঞ্জ ব্রিজের ঘটনাস্থলটি দেখলে তারা আনমনা হয়ে যায়। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে কাটে তাদের সময়।